পঞ্চদশ অধ্যায়

পুরুষোত্তম-যোগ

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্ ।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **ঊর্ধ্বমূলম্**—ঊর্ধ্বমূল; **অধঃ**—নিম্নমুখী; **শাখম্**—শাখাবিশিষ্ট; **অশ্বত্থম্**—অশ্বত্থ বৃক্ষ; **প্রাহুঃ**—বলা হয়েছে; **অব্যয়ম্**—নিত্য; **ছন্দাংসি**—বৈদিক মন্ত্রসমূহ; **যস্য**—যার; **পর্ণানি**—পত্রসমূহ; **যঃ**—যিনি; **ত্বম্**—সেই; **বেদ**—জানেন; **সঃ**—তিনি; **বেদবিৎ**—বেদজ্ঞ।

গীতার গান

শ্রীভগবান কহিলেন ঃ

বেদবাণী কর্মকাণ্ডী সংসার আশ্রয় ।
নানা যোনি প্রাপ্ত হয় কভু মুক্ত নয় ॥
সংসার যে বৃক্ষ সেই অশ্বত্থ অব্যয় ।
ঊর্ধ্বমূল অধঃশাখা নাহি তার ক্ষয় ॥
পুষ্পিত বেদের ছন্দ সে ব্রহ্মের পত্র ।
মোহিত সে বেদবাক্য জগৎ সর্বত্র ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—ঊর্ধ্বমূল ও অধঃশাখা-বিশিষ্ট একটি অব্যয় অশ্বত্থ বৃক্ষের কথা বলা হয়েছে। বৈদিক মন্ত্রসমূহ সেই বৃক্ষের পত্রস্বরূপ। যিনি সেই বৃক্ষটিকে জানেন, তিনিই বেদজ্ঞ।

তাৎপর্য

ভক্তিযোগের গুরুত্ব আলোচনা করার পর কেউ প্রশ্ন করতে পারে, তা হলে *বেদের* অর্থ কি? এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, *বেদ* অধ্যয়ন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানা। সুতরাং যিনি কৃষ্ণভাবনাময়, যিনি ভগবানের ভক্তিযুক্ত সেবায় নিযুক্ত হয়েছেন, তিনি ইতিমধ্যেই *বেদের* পূর্ণ জ্ঞান আহরণ করেছেন।

জড় জগতের বন্ধনকে এখানে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যে সকাম কর্মে রত, তার কাছে এই অশ্বত্থ বৃক্ষটির কোন শেষ নেই। সে এক ডাল থেকে আর এক ডালে, সেখান থেকে অন্য এক ডালে, আবার আর এক ডালে, এভাবেই সে ঘুরে বেড়ায়। এই জড় জগৎরূপী বৃক্ষটির কোন অন্ত নেই এবং যে এই বৃক্ষটির প্রতি আসক্ত, তার পক্ষে মুক্তি লাভের কোনই সম্ভাবনা নেই। মানুষকে ঊর্ধ্বমুখী করবার জন্য যে বৈদিক ছন্দ, তাকে এই বৃক্ষের পাতারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এই বৃক্ষের মূলটি ঊর্ধ্বমুখী, কারণ তার শুরু হয়েছে যেখানে ব্রহ্মা অধিষ্ঠিত সেখান থেকে, অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ গ্রহলোক থেকে। কেউ যখন মায়াময় এই অব্যয় বৃক্ষটির সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন, তখন তিনি তার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন।

মুক্ত হওয়ার এই পন্থাটিকে ভালভাবে উপলব্ধি করা উচিত। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার নানা রকম পন্থা বর্ণিত হয়েছে এবং ত্রয়োদশ অধ্যায় পর্যন্ত আমরা দেখেছি যে, ভক্তিযোগে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করাই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। এখন, ভক্তিযোগের মূল তত্ত্ব হচ্ছে জড়-জাগতিক কর্মে অনাসক্তি এবং ভগবানের অপ্রাকৃত সেবার প্রতি আসক্তি। এই অধ্যায়ের শুরুতে জড় জগতের প্রতি আসক্তির বন্ধন ছিন্ন করার পন্থা বর্ণনা করা হয়েছে। এই জড় অস্তিত্বের মূল ঊর্ধ্বমুখী। তার অর্থ হচ্ছে, এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চলোকে মহৎ-তত্ত্বের জড়-জাগতিক অস্তিত্ব থেকে তার শুরু হয়। সেখান থেকে গ্রহমণ্ডলরূপী বিভিন্ন শাখা সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। তার ফল হচ্ছে জীবের কর্মফল, যেমন ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ।

এখন এই জগতে এমন কোন গাছের অভিজ্ঞতা আমাদের নেই, যার শাখা নিম্নমুখী আর মূল ঊর্ধ্বমুখী, কিন্তু সেটি আছে। সেই গাছ দেখতে পাওয়া যায় একটি জলাশয়ের ধারে। আমরা দেখতে পাই যে, জলাশয়ের তীরের বৃক্ষগুলির শাখা নিম্নমুখী ও মূল ঊর্ধ্বমুখী হয়ে জলে প্রতিবিম্বিত হয়। পক্ষান্তরে বলা যায়, এই জড় জগতের বৃক্ষটি হচ্ছে চিৎ-জগতের বাস্তব বৃক্ষটির প্রতিবিম্ব। জলে যেমন বৃক্ষের ছায়া পড়ে, তেমনই চিৎ-জগতের ছায়া পড়ে আমাদের কামনার উপর। প্রতিবিম্বিত জড় আকাশে বস্তুর অবস্থিতির কারণ হচ্ছে কামনা-বাসনা। এই জড় অস্তিত্বের বন্ধন থেকে যে মুক্ত হতে চায়, তাকে অবশ্যই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে এই বৃক্ষটি সম্বন্ধে যথার্থভাবে জানতে হবে। তা হলে তার বন্ধন সে ছিন্ন করতে পারে।

এই বৃক্ষটি বাস্তব বৃক্ষটির প্রতিবিম্ব হওয়ার ফলে, তার অবিকল প্রতিরূপ। চিৎ-জগতে সব কিছুই আছে। নির্বিশেষবাদীরা মনে করে যে, জড় জগৎরূপী বৃক্ষের মূল হচ্ছে ব্রহ্ম এবং সাংখ্য দর্শন অনুযায়ী, সেই মূল থেকে প্রকৃতি ও পুরুষ, তারপর প্রকৃতির তিনটি গুণ, তারপর পঞ্চ-মহাভূত, তারপর দশেন্দ্রিয়, মন আদির প্রকাশ হয়। এভাবেই তারা সমস্ত জড় জগৎকে চব্বিশটি উপাদানে বিভক্ত করে। ব্রহ্ম যদি সমস্ত প্রকাশের কেন্দ্র হন, তা হলে এই জড় জগতের প্রকাশ হচ্ছে কেন্দ্র থেকে ১৮০ ডিগ্রী বা একটি অর্ধবৃত্ত এবং অপর ১৮০ ডিগ্রী বা অপর অর্ধাংশ হচ্ছে চিৎ-জগৎ। জড় জগৎ যদি বিকৃত প্রতিবিম্ব হয়, তা হলে চিৎ-জগতে অবশ্যই সেই একই ধরনের বৈচিত্র্য রয়েছে, কিন্তু তা রয়েছে বাস্তবভাবে। 'প্রকৃতি' হচ্ছে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি এবং 'পুরুষ' হচ্ছেন ভগবান স্বয়ং। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই প্রকাশ যেহেতু জড়, তাই তা অনিত্য, অস্থায়ী। প্রতিবিম্ব অস্থায়ী, কেন না কখনও কখনও তাকে দেখা যায়, আবার কখনও কখনও তাকে দেখা যায় না। কিন্তু তার উৎস, যেখান থেকে প্রতিবিম্ব প্রতিবিম্বিত হচ্ছে, তা নিত্য। জড় আকাশে সেই বৃক্ষের জড় প্রতিবিম্বটি কেটে বাদ দিতে হবে। যখন বলা হয় যে, কেউ *বেদ* সম্বন্ধে জানেন, তখন অনুমান করা হয় যে, এই জড় জগতের আসক্তি কিভাবে ছিন্ন করা যায়, তা তিনি জানেন। এই পন্থা যিনি জানেন, তিনি হচ্ছেন যথার্থ বেদজ্ঞ। *বেদের* কর্মকাণ্ডের প্রতি যে আকৃষ্ট, বুঝতে হবে সে বৃক্ষটির সবুজ পত্রের প্রতি আকৃষ্ট। *বেদের* যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সে অবগত নয়। *বেদের* উদ্দেশ্য পরম পুরুষ নিজেই বর্ণনা করেছেন, তা হচ্ছে প্রতিবিম্ব বৃক্ষটি কেটে বাদ দিয়ে চিৎ-জগতের বাস্তব বৃক্ষটি লাভ করা।

শ্লোক ২

অধশ্চোর্ধ্বং প্রসৃতাস্তস্য শাখা
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি
কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২ ॥

অধঃ—নিম্নমুখী; **চ**—এবং; **ঊর্ধ্বম্**—ঊর্ধ্বমুখী; **প্রসৃতাঃ**—বিস্তৃত; **তস্য**—তার; **শাখাঃ**—শাখাসমূহ; **গুণ**—জড়া প্রকৃতির গুণসমূহের দ্বারা; **প্রবৃদ্ধাঃ**—পরিবর্ধিত; **বিষয়**—ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ; **প্রবালাঃ**—পল্লব; **অধঃ**—অধোমুখী; **চ**—এবং; **মূলানি**—মূলসমূহ; **অনুসন্ততানি**—প্রসারিত; **কর্ম**—কর্মের প্রতি; **অনুবন্ধীনি**—আবদ্ধ; **মনুষ্যলোকে**—নরলোকে।

গীতার গান

বৃক্ষের সে শাখাগুলি ঊর্ধ্ব অধঃগতি ।
গুণের বশেতে যার যথা বিধিমতি ॥
সে বৃক্ষের শাখা যত বিষয়ের ভোগ ।
নিজ কর্ম অনুসারে যত ভবরোগ ॥
বদ্ধজীব ঘুরে সেই বৃক্ষ ডালে ডালে ।
মনুষ্যলোক সে ভুঞ্জে নিজ কর্মফলে ॥

অনুবাদ

এই বৃক্ষের শাখাসমূহ জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা পুষ্ট হয়ে অধোদেশে ও ঊর্ধ্বদেশে বিস্তৃত। ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহই এই শাখাগণের পল্লব। এই বৃক্ষের মূলগুলি অধোদেশে প্রসারিত এবং সেগুলি মনুষ্যলোকে সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ।

তাৎপর্য

সেই অশ্বত্থ বৃক্ষটির বর্ণনা সম্বন্ধে এখানে পুনরায় ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। তার ডালপালাগুলি চতুর্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে। তার নিম্নাংশে মানুষ, পশু, গরু, ঘোড়া, কুকুর, বেড়াল আদি বৈচিত্র্যময় জীবের বিভিন্ন প্রকাশ হয়েছে। এরা অধোমুখী শাখাগুলিতে অবস্থিত এবং ঊর্ধ্বমুখী শাখাগুলিতে রয়েছে দেবতা, গন্ধর্ব আদি উচ্চ

প্রজাতির জীবসমূহ। বৃক্ষ যেমন জলের দ্বারা পুষ্ট হয়, তেমনই এই বৃক্ষটি পুষ্ট হয় জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা। কখনও কখনও আমরা দেখি যে, জলের অভাবে কোন কোন জমি অনুর্বর, আবার কোন কোন জমি খুব উর্বর, তেমনই জড়া প্রকৃতির গুণের মাত্রা অনুসারে বিভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন রকম প্রজাতির প্রকাশ হয়।

সেই বৃক্ষের পল্লবগুলি হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ। প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের বিকাশের ফলে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের বিকাশ হয় এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা নানা রকম ইন্দ্রিয়ের বিষয় উপভোগ করি। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা আদি ইন্দ্রিয়গুলি হচ্ছে ডালপালার ডগা, যা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলি উপভোগের প্রতি আসক্ত। তার পল্লবগুলি হচ্ছে শব্দ, রূপ, স্পর্শ আদি ইন্দ্রিয়-বিষয় বা তন্মাত্র। তার শাখামূলগুলি হচ্ছে নানা রকম সুখ ও দুঃখজাত আসক্তি ও বিরক্তি। সর্বদিকে বিস্তৃত গৌণ মূলগুলি থেকে ধর্ম ও অধর্ম, পাপ ও পুণ্যকর্ম করার প্রবণতা উদয় হয়। মুখ্য মূলটি আসছে ব্রহ্মলোক থেকে এবং অন্যান্য মূলগুলি রয়েছে মনুষ্য গ্রহলোকগুলিতে। উচ্চতর লোকে গিয়ে পুণ্যকর্মের ফল ভোগ করার পর সে আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসে এবং পুনরায় ফলাশ্রয়ী কর্মের মাধ্যমে উন্নীত হতে চায়। এই মনুষ্যলোক হচ্ছে জীবের কর্মক্ষেত্র।

শ্লোক ৩-৪

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা ।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলম্
অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥ ৩ ॥
ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪ ॥

ন—না; **রূপম্**—রূপ; **অস্য**—এই বৃক্ষের; **ইহ**—এই জগতে; **তথা**—ও; **উপলভ্যতে**—উপলব্ধ হয়; **ন**—না; **অন্তঃ**—শেষ; **ন**—না; **চ**—ও; **আদিঃ**—শুরু;

ন—না; **চ**—ও; **সংপ্রতিষ্ঠা**—সম্যক স্থিতি; **অশ্বত্থম্**—অশ্বত্থ বৃক্ষ; **এনম্**—এই; **সুবিরূঢ়**—সুদৃঢ়; **মূলম্**—মূল; **অসঙ্গশস্ত্রেণ**—বৈরাগ্যরূপ অস্ত্রের দ্বারা; **দৃঢ়েন**—তীব্র; **ছিত্ত্বা**—ছেদন করে; **ততঃ**—তারপর; **পদম্**—পদ; **তৎ**—সেই; **পরিমার্গিতব্যম্**—অন্বেষণ করা কর্তব্য; **যস্মিন্**—যেখানে; **গতাঃ**—গমন করলে; **ন**—না; **নিবর্তন্তি**—ফিরে আসতে হয়; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **ত্বম্**—তাঁকে; **এব**—অবশ্যই; **চ**—ও; **আদ্যম্**—আদি; **পুরুষম্**—পুরুষের প্রতি; **প্রপদ্যে**—শরণ গ্রহণ কর; **যতঃ**—যাঁর থেকে; **প্রবৃত্তিঃ**—প্রবর্তন; **প্রসৃতা**—বিস্তৃত হয়েছে; **পুরাণী**—স্মরণাতিত কাল থেকে।

গীতার গান

ক্ষুদ্রবুদ্ধি মনুষ্য সে সীমা নাহি পায় ।
অনন্ত আকাশে তার আদি অন্ত নয় ॥
কিবা রূপ সে বৃক্ষের তাহা নাহি বুঝে ।
অনন্তকালের মধ্যে জীব যুদ্ধ যুঝে ॥
সে অশ্বত্থ বৃক্ষ হয় সুদৃঢ় যে মূল ।
সে মূল কাটিতে হয় শত শত ভুল ॥
অনাসক্তি এক অস্ত্র সে মূল কাটিতে ।
সেই সে যে দৃঢ় অস্ত্র সংসার জিনিতে ॥
কাটিয়া সে বৃক্ষমূল সত্যের সন্ধান ।
ভাগ্যক্রমে যার হয় তাতে অবস্থান ॥
সে যায় বৈকুণ্ঠলোকে ফিরে নাহি আসে ।
এ বৃক্ষের মূল যথা সে পুরুষ পাশে ॥
সে আদি পুরুষে অদ্য কর যে প্রপত্তি ।
জন্মাদি সে যাহা হতে প্রকৃতি প্রবৃত্তি ॥

অনুবাদ

এই বৃক্ষের স্বরূপ এই জগতে উপলব্ধ হয় না। এর আদি, অন্ত ও স্থিতি যে কোথায় তা কেউই বুঝতে পারে না। তীব্র বৈরাগ্যরূপ অস্ত্রের দ্বারা দৃঢ়মূল এই বৃক্ষকে ছেদন করে সত্য বস্তুর অন্বেষণ করা কর্তব্য, যেখানে গমন করলে, পুনরায় ফিরে আসতে হয় না। স্মরণাতীত কাল হতে যাঁর থেকে সমস্ত কিছু প্রবর্তন ও বিস্তৃত হয়েছে, সেই আদি পুরুষের প্রতি শরণাগত হও।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, এই অশ্বত্থ বৃক্ষের প্রকৃত রূপ এই জড় জগতের পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে পারা যায় না। যেহেতু তার মূল ঊর্ধ্বমুখী, তাই প্রকৃত বৃক্ষটির বিস্তার হচ্ছে অপর দিকে। সে বৃক্ষটি যে কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত তা কেউ দেখতে পায় না এবং বৃক্ষটির শুরু যে কোথায় তাও কেউ দেখতে পায় না। তবুও তার কারণ খুঁজে বার করতে হবে। "আমি আমার পিতার পুত্র, আমার পিতা অমুক ব্যক্তির পুত্র ইত্যাদি।" এভাবেই অনুসন্ধান করতে করতে মানুষ ব্রহ্মাতে এসে পৌঁছায়। ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়েছে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু থেকে। এভাবেই অবশেষে যখন কেউ পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কাছে পৌঁছায়, তখনই তার এই গবেষণার শেষ হয়। ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত সাধুদের সঙ্গের মাধ্যমে এই বৃক্ষটির উৎস পরম পুরুষোত্তম ভগবানের অনুসন্ধান করতে হবে। তার ফলে যথার্থ জ্ঞানের প্রভাবে ধীরে ধীরে এই জড় জগতের বিকৃত প্রতিফলন থেকে মুক্ত হওয়া যাবে। এভাবেই জ্ঞানের দ্বারা জড় জগতের সংযোগ ছিন্ন করে চিৎ-জগতের বাস্তব বৃক্ষে অধিষ্ঠিত হওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে *অসঙ্গ* কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার এবং জড় জগতের উপর আধিপত্য করার আসক্তি অত্যন্ত প্রবল। তাই, প্রামাণ্য শাস্ত্রের ভিত্তিতে ভগবৎ-তত্ত্ব বিজ্ঞান আলোচনা করার মাধ্যমে এবং যথার্থ জ্ঞানী ব্যক্তির কাছ থেকে ভগবানের কথা শ্রবণ করার মাধ্যমে বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হওয়ার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। ভক্তসঙ্গে এই ধরনের আলোচনা করার ফলে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সমীপবর্তী হওয়া যায়। তারপর সর্বপ্রথমে যা অবশ্য করণীয়, তা হচ্ছে তাঁর শ্রীচরণারবিন্দে আত্মসমর্পণ করা। সেই পরম ধামের বর্ণনায় এখানে বলা হয়েছে যে, একবার সেখানে গেলে এই প্রতিবিম্বরূপী বৃক্ষে আর ফিরে আসতে হয় না। পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি মূল, যাঁর থেকে সব কিছু প্রকাশিত হয়েছে। সেই পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা লাভ করতে হলে কেবলমাত্র আত্মসমর্পণ করতে হবে। এই আত্মসমর্পণই হচ্ছে শ্রবণ, কীর্তন আদি নববিধা ভক্তি অনুশীলনের চরম পরিণতি। এই জড় জগতের বিস্তারের কারণ হচ্ছেন ভগবান। ভগবান নিজেই ইতিমধ্যে সেই সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করে বলেছেন, *অহং সর্বস্য প্রভবঃ*—"আমি সব কিছুরই উৎস"। সুতরাং, জড়-জাগতিক জীবনরূপ অত্যন্ত কঠিন এই অশ্বত্থ বৃক্ষের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হলে শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোন গতি নেই। শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করলে অনায়াসে এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ৫

নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫ ॥

নিঃ—শূন্য; **মান**—অভিমান; **মোহাঃ**—মোহ; **জিত**—বিজিত; **সঙ্গ**—সঙ্গের; **দোষাঃ**—দোষ; **অধ্যাত্ম**—পারমার্থিক জ্ঞানে; **নিত্যাঃ**—নিত্যত্ব; **বিনিবৃত্ত**—বর্জিত; **কামাঃ**—কামনা-বাসনা; **দ্বন্দ্বৈঃ**—দ্বন্দ্বসমূহ থেকে; **বিমুক্তাঃ**—মুক্ত; **সুখদুঃখ**—সুখ ও দুঃখ; **সংজ্ঞৈঃ**—নামক; **গচ্ছন্তি**—লাভ করেন; **অমূঢ়াঃ**—মোহমুক্ত ব্যক্তিগণ; **পদম্**—পদ; **অব্যয়ম্**—নিত্য; **তৎ**—সেই।

গীতার গান

নিরভিমান নির্মোহ সঙ্গদোষে মুক্ত ।
নিত্যানিত্য বুদ্ধি যার কামনা নিবৃত্ত ॥
সুখ দুঃখ দ্বন্দ্ব মুক্ত জড় মূঢ় নয় ।
বিধিজ্ঞ পুরুষ পায় সে পদ অব্যয় ॥

অনুবাদ

যাঁরা অভিমান ও মোহশূন্য, সঙ্গদোষ রহিত, নিত্য-অনিত্য বিচার-পরায়ণ, কামনা-বাসনা বর্জিত, সুখ-দুঃখ আদি দ্বন্দ্বসমূহ থেকে মুক্ত এবং মোহমুক্ত, তাঁরাই সেই অব্যয় পদ লাভ করেন।

তাৎপর্য

শরণাগতির পন্থা এখানে খুব সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। তার প্রথম যোগ্যতা হচ্ছে গর্বের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন না হওয়া। কারণ, বদ্ধ জীব নিজেকে জড়া প্রকৃতির অধিপতি বলে মনে করে গর্বস্ফীত। তাই, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করা তার পক্ষে খুব কঠিন। যথার্থ জ্ঞান অনুশীলন করার মাধ্যমে তাকে জানতে হবে যে, সে জড়া প্রকৃতির অধিপতি নয়। অধিপতি হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। অহঙ্কার-জনিত মোহ থেকে কেউ যখন মুক্ত হয়, তখন সে আত্মসমর্পণের পন্থা শুরু করতে পারে। যে সর্বদাই এই জড় জগতে সম্মানের

আকাঙ্ক্ষা করে, তার পক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করা সম্ভব নয়। মোহের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ার ফলেই অহঙ্কারের উদয় হয়; কারণ জীব যদিও অল্প দিনের জন্য এখানে আসে এবং তারপর বিদায় নিয়ে চলে যায়, তবুও মূর্খের মতো সে মনে করে যে, সে এই জগতের অধীশ্বর। এভাবেই সে সব কিছু জটিল করে তোলে এবং তার ফলে সে সর্বদাই দুর্দশাগ্রস্ত। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সমস্ত জগৎ চালিত হচ্ছে। মানুষ মনে করছে যে, সারা পৃথিবীটাই মানব-সমাজের সম্পত্তি এবং মিথ্যা মালিকানার ভ্রান্তবোধে তারা পৃথিবীটাকে ভাগ করে নিয়েছে। মনুষ্য-সমাজ যে এই জগতের মালিক, সেই ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হতে হবে। এই ধরনের ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হলে পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয়তা বোধের ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। এই সমস্ত মিথ্যা বন্ধনগুলি মানুষকে জড় জগতে আবদ্ধ করে রাখে। এই স্তর অতিক্রম করার পর দিব্যজ্ঞান অনুশীলন করতে হবে। যথার্থ জ্ঞানের মাধ্যমে তাকে জানতে হবে কোন জিনিসগুলি তার এবং কোনগুলি তার নয়। সব কিছু সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ হলে মানুষ সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনার দ্বন্দ্বভাব থেকে মুক্ত হয়। সে যখন পূর্ণজ্ঞান লাভ করে, তখনই কেবল পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করা সম্ভব হয়।

শ্লোক ৬

ন তদ্ ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ ।
যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ ॥

ন—না; **তৎ**—তা; **ভাসয়তে**—আলোকিত করতে পারে; **সূর্যঃ**—সূর্য; **ন**—না; **শশাঙ্কঃ**—চন্দ্র; **ন**—না; **পাবকঃ**—অগ্নি, বিদ্যুৎ; **যৎ**—যেখানে; **গত্বা**—গেলে; **ন**—না; **নিবর্তন্তে**—ফিরে আসে; **তৎ ধাম**—সেই ধাম; **পরমম্**—পরম; **মম**—আমার।

গীতার গান

সে আকাশে জ্যোতির্ময়ে সূর্য বা শশাঙ্ক ।
আবশ্যক নাহি তথা কিংবা সে পাবক ॥
সেখানে প্রবেশ হলে ফিরে নাহি আসে ।
নিত্যকাল মোর ধামে সে জন নিবাসে ॥

অনুবাদ

সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি বা বিদ্যুৎ আমার সেই পরম ধামকে আলোকিত করতে পারে না। সেখানে গেলে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না।

তাৎপর্য

চিন্ময় জগৎ বা পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধাম—কৃষ্ণলোক বা গোলোক বৃন্দাবন সম্বন্ধে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। চিদাকাশে সূর্যকিরণ, চন্দ্রকিরণ, অগ্নি অথবা বৈদ্যুতিক শক্তির কোন প্রয়োজন হয় না, কারণ সেখানে সব কয়টি গ্রহই জ্যোতির্ময়। এই ব্রহ্মাণ্ডে কেবল একটি গ্রহ সূর্য হচ্ছে জ্যোতির্ময়। কিন্তু চিদাকাশে সব কয়টি গ্রহই জ্যোতির্ময়। বৈকুণ্ঠলোক নামক এই সমস্ত গ্রহে উজ্জ্বল জ্যোতির দ্বারা ব্রহ্মজ্যোতি নামক চিদাকাশ প্রকাশিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই ব্রহ্মজ্যোতি বিচ্ছুরিত হয় শ্রীকৃষ্ণের আলয় গোলোক বৃন্দাবন থেকে। সেই অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির কিয়দংশ মহৎ-তত্ত্ব দ্বারা আচ্ছাদিত। সেটিই হচ্ছে জড় জগৎ। এই জড় জগৎ ছাড়া সেই জ্যোতির্ময় আকাশের অধিকাংশ স্থানই চিন্ময় গ্রহলোকসমূহে পরিপূর্ণ, যাদের বলা হয় বৈকুণ্ঠ এবং তাদের সর্বোচ্চ শিখরে গোলোক বৃন্দাবন অবস্থিত।

জীব যতক্ষণ পর্যন্ত এই অন্ধকারাচ্ছন্ন জড় জগতে থাকে, সে বদ্ধ জীবন যাপন করে। কিন্তু যখনই সে জড় জগতের মিথ্যা, বিকৃত বৃক্ষটি কেটে ফেলে চিৎ-জগতে প্রবেশ করে, তখনই সে মুক্ত হয়। তখন আর তাকে এখানে ফিরে আসতে হয় না। বদ্ধ অবস্থায় জীব নিজেকে জড় জগতের অধীশ্বর বলে মনে করে। কিন্তু মুক্ত অবস্থায় সে যখন ভগবানের রাজত্বে প্রবেশ করে, তখন সে পরমেশ্বর ভগবানের পার্ষদত্ব লাভ করে এবং সেখানে সে সৎ-চিৎ-আনন্দময় জীবন উপভোগ করে।

এই তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি সকলেরই আকৃষ্ট হওয়া উচিত। বাস্তবের ভ্রান্ত প্রতিবিম্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করে সেই নিত্য পরম ধামে ফিরে যাবার জন্য সকলেরই বাসনা করা উচিত। যারা এই জড় জগতের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের পক্ষে সেই আসক্তি ছিন্ন করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু তারা যদি কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করে, তা হলে সেই আসক্তির বন্ধন থেকে ধীরে ধীরে মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত ভগবদ্ভক্তদের সঙ্গ করা। যে সমাজ ঐকান্তিকভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় উৎসর্গীকৃত, সেই রকম সমাজ খুঁজে বার করতে হবে এবং তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করার সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। এভাবেই মানুষ জড় জগতের প্রতি আসক্তি ছেদন করতে পারে। গেরুয়া কাপড় পরলেই কেবল জড় জগতের আকর্ষণ থেকে মুক্ত

হওয়া যায় না। ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করার প্রতি তাকে আসক্ত হতেই হবে। সুতরাং, প্রকৃত বৃক্ষের বিকৃত প্রতিফলনের থেকে মুক্ত হওয়ার যে পন্থা ভক্তিযোগ, যা দ্বাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, তা গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করা উচিত। চতুর্দশ অধ্যায়ে জড়-জাগতিক সব কয়টি পন্থার দোষ প্রদর্শন করা হয়েছে। কেবলমাত্র ভক্তিযোগকে শুদ্ধ গুণাতীত বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

এই শ্লোকটিতে *পরমং মম* কথাটির ব্যবহার খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে সব কিছুই ভগবানের সম্পত্তি, কিন্তু চিৎ-জগৎ হচ্ছে *পরমম্*, অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। *কঠ উপনিষদে* (২/২/১৫) বলা হয়েছে যে, চিৎ-জগতে সূর্যকিরণ, চন্দ্রকিরণ ও তারকা-মণ্ডলীর কোন প্রয়োজন নেই (*ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্*)। কারণ, সমগ্র চিদাকাশ পরমেশ্বর ভগবানের অন্তরঙ্গা জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। পরম ধাম প্রাপ্ত হওয়া যায় কেবল ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করার মাধ্যমে। এ ছাড়া আর কোন উপায়ে তা সম্ভব হয় না।

শ্লোক ৭

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭ ॥

মম—আমার; **এব**—অবশ্যই; **অংশঃ**—বিভিন্নাংশ; **জীবলোকে**—জড় জগতে; **জীবভূতঃ**—বদ্ধ জীব; **সনাতনঃ**—নিত্য; **মনঃ**—মন সহ; **ষষ্ঠানি**—ছয়; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়গুলিকে; **প্রকৃতি**—জড়া প্রকৃতিতে; **স্থানি**—স্থিত; **কর্ষতি**—কঠোর সংগ্রাম করছে।

গীতার গান

যত জীব মোর অংশ নহে সে অপর ।
সনাতন তার সত্তা জীবলোকে ঘোর ॥
এখানে সে মন আর ইন্দ্রিয়বন্ধনে ।
কর্ষণ করয়ে কত প্রকৃতির স্থানে ॥

অনুবাদ

এই জড় জগতে বদ্ধ জীবসমূহ আমার সনাতন বিভিন্নাংশ। জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে তারা মন সহ ছয়টি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্রে কঠোর সংগ্রাম করছে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিতে জীবের যথার্থ পরিচয় সম্বন্ধে বর্ণনা করা হচ্ছে। সনাতনভাবে জীব হচ্ছে ভগবানের অতি ক্ষুদ্র বিভিন্নাংশ। এমন নয় যে, বদ্ধ অবস্থায় জীব স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে এবং মুক্ত অবস্থায় সে ভগবানের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। সনাতনভাবেই জীবসত্তা ভগবানের অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ-স্বরূপ। *সনাতনঃ* কথাটি এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বৈদিক বর্ণনা অনুসারে ভগবান নিজেকে অনন্তরূপে প্রকাশ করেন, যার মুখ্য প্রকাশকে বলা হয় বিষ্ণুতত্ত্ব এবং গৌণ প্রকাশকে বলা হয় জীবসত্তা। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, বিষ্ণুতত্ত্ব হচ্ছে ভগবানের স্বাংশ-প্রকাশ এবং জীবসত্তা হচ্ছে বিভিন্নাংশ-প্রকাশ। তাঁর স্বাংশ-প্রকাশে তিনি রামচন্দ্র, নৃসিংহদেব, বিষ্ণুমূর্তি এবং বিভিন্ন বৈকুণ্ঠলোকের অধীশ্বর আদি নানারূপে প্রকাশিত হন। বিভিন্নাংশ প্রকাশ জীবসমূহ ভগবানের নিত্যদাস। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের স্বাংশ-প্রকাশসমূহের স্বতন্ত্র স্বরূপগুলি নিত্য বর্তমান। তেমনই, বিভিন্নাংশ জীবদেরও স্বতন্ত্র পরিচয় রয়েছে। ভগবানের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ হবার ফলে, ভগবানের গুণাবলীর অণুসদৃশ অংশ জীবদের মধ্যেও রয়েছে, যার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য হচ্ছে একটি। স্বতন্ত্র আত্মারূপে প্রতিটি জীবেরই ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ও ক্ষুদ্র স্বাধীনতা রয়েছে। সেই ক্ষুদ্র স্বাধীনতার অপব্যবহার করার ফলে জীবাত্মা বদ্ধ হয়ে পড়ে এবং স্বাধীনতার যথাযথ সদ্ব্যবহার করলে সে সর্বদা মুক্ত থাকে। উভয় ক্ষেত্রেই সে পরমেশ্বর ভগবানের মতো গুণগতভাবে নিত্য। মুক্ত অবস্থায় সে জড় জগতের পরিবেশ থেকে মুক্ত এবং সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় যুক্ত। বদ্ধ অবস্থায় সে জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত থাকে এবং অপ্রাকৃত ভগবৎ সেবার কথা সে ভুলে যায়। তার ফলে, এই জড় জগতে তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়।

কেবল কুকুর, বেড়াল, মানুষই নয়, এমন কি জড় জগতের নিয়ন্ত্রণকারী—ব্রহ্মা, শিব এমন কি বিষ্ণু পর্যন্ত পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ-বিশেষ। তাঁরা সকলেই নিত্য, তাঁদের প্রকাশ সাময়িক নয়। এখানে *কর্ষতি* ('সংগ্রাম করা' অথবা 'জোর করে আঁকড়ে ধরা') কথাটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। বদ্ধ জীব যেন লৌহ শৃঙ্খলের মতো অহঙ্কারের দ্বারা শৃঙ্খলিত এবং তার মন হচ্ছে তার মুখ্য প্রতিনিধি, যে তাকে জড় অস্তিত্বের দিকে ধাবিত করছে। মন যখন সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত থাকে, তখন তার কার্যকলাপ শুদ্ধ হয়। মন যখন রজোগুণে অধিষ্ঠিত থাকে, তখন তার কার্যকলাপ পীড়াদায়ক হয় এবং মন যখন তমোগুণে থাকে, তখন সে নিম্নতর প্রজাতিরূপে বিচরণ করে। এই শ্লোকে এটি স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, বদ্ধ জীবাত্মা মন ও ইন্দ্রিয় সমন্বিত জড় দেহের দ্বারা আবৃত এবং সে যখন মুক্ত হয়

তখন এই জড় আবরণ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তার স্বরূপ সমন্বিত চিন্ময় দেহ নিজস্ব সামর্থ্যে প্রকাশিত হয়। *মাধ্যন্দিনায়ন শ্রুতিতে* এই তথ্যগুলি প্রদান করা হয়েছে—*স বা এষ ব্রহ্মনিষ্ঠ ইদং শরীরং মর্ত্যমতিসৃজ্য ব্রহ্মাভিসম্পদ্য ব্রহ্মণা পশ্যতি ব্রহ্মণা শৃণোতি ব্রহ্মণৈবেদং সর্বমনুভবতি*। এখানে বলা হয়েছে যে, যখন জীবাত্মা তাঁর জড় আবরণ পরিত্যাগ করে চেতন জগতে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর চিন্ময় শরীর পুনরুজ্জীবিত হয় এবং তাঁর চিন্ময় শরীরে তিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেন। তিনি তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে কথা বলতে পারেন, তাঁর কথা শুনতে পারেন এবং যথাযথভাবে পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন। *স্মৃতি* শাস্ত্রেও জানতে পারা যায় যে, *বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্বে বৈকুণ্ঠমূর্তয়ঃ*—বৈকুণ্ঠলোকে সকলেই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মতো রূপ নিয়ে বিরাজ করেন। সেখানে বিষ্ণুমূর্তির প্রকাশ এবং তাঁর বিভিন্নাংশ জীবাত্মাদের দেহের গঠনে কোন পার্থক্য নেই। পক্ষান্তরে বলা যায়, জীব মুক্ত হলে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কৃপায় দিব্য শরীর প্রাপ্ত হন।

এখানে *মমৈবাংশঃ* ('পরমেশ্বর ভগবানের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ') কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পরমেশ্বর ভগবানের অণুসদৃশ অংশ কোন জড় পদার্থের ভাঙা অংশের মতো নয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছি যে, আত্মাকে খণ্ড খণ্ড করে কাটা যায় না। এই অণুসদৃশ অংশকে জড় বুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি করা যায় না। এটি জড় পদার্থের মতো নয়, যা কেটে টুকরো টুকরো করা যায়, তারপর আবার জোড়া লাগিয়ে দেওয়া যায়। সেই ধারণা এখানে প্রযোজ্য নয়, কারণ এখানে সংস্কৃত *সনাতন* ('নিত্য') কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। ভগবানের অণুসদৃশ অংশগুলিও নিত্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমদিকে এটিও বলা হয়েছে যে, প্রতিটি দেহে ভগবানের অণুসদৃশ অংশ আত্মা বর্তমান থাকে (*দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে*)। সেই অণুসদৃশ অংশ যখন জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়, তখন চিদাকাশে চিন্ময় গ্রহলোকে তার আদি চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গ লাভ করার আনন্দ উপভোগ করে। এখানে অবশ্য এটি বোঝা যাচ্ছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের অণুসদৃশ অংশ হওয়ার ফলে জীব গুণগতভাবে ভগবানের সঙ্গে এক, যেমন সোনার একটি কণাও সোনা।

শ্লোক ৮

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮ ॥

শরীরম্—দেহ; **যৎ**—যেমন; **অবাপ্নোতি**—প্রাপ্ত হয়; **যৎ**—যা; **চ অপি**—ও; **উৎক্রামতি**—নিষ্ক্রান্ত হয়; **ঈশ্বরঃ**—দেহের ঈশ্বর; **গৃহীত্বা**—গ্রহণ করে; **এতানি**—এই সমস্ত; **সংযাতি**—গমন করে; **বায়ুঃ**—বায়ু; **গন্ধান্**—গন্ধ; **ইব**—মতন; **আশয়াৎ**—ফুল থেকে।

গীতার গান

বার বার কত দেহ সে যে প্রাপ্ত হয় ।
এক দেহ ছাড়ে আর অন্যে প্রবেশয় ॥
বায়ু গন্ধ যথা যায় স্থান স্থানান্তরে ।
কর্মফল সূক্ষ্ম সেই দেহ দেহান্তরে ॥

অনুবাদ

বায়ু যেমন ফুলের গন্ধ নিয়ে অন্যত্র গমন করে, তেমনই এই জড় জগতে দেহের ঈশ্বর জীব এক শরীর থেকে অন্য শরীরে তার জীবনের বিভিন্ন ধারণাগুলি নিয়ে যায়।

তাৎপর্য

এখানে জীবকে *ঈশ্বর* বা তার দেহের নিয়ন্তা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সে যদি ইচ্ছা করে, তা হলে সে তার দেহকে উচ্চতর শ্রেণীতে পরিবর্তন করতে পারে এবং সে যদি ইচ্ছা করে তা হলে নিম্নতর শ্রেণীতে অধঃপতিত হতে পারে। তার অতি ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্য এই ক্ষেত্রে আছে। তার শরীরের সমস্ত পরিবর্তন নির্ভর করে তার সেই স্বাতন্ত্র্যের উপর। তার চেতনাকে সে যেভাবে গড়ে তুলেছে, মৃত্যুর পর তা তাকে পরবর্তী শরীরে নিয়ে যাবে। তার চেতনাকে যদি সে একটি কুকুর বা একটি বেড়ালের চেতনার মতো করে গড়ে তোলে, তা হলে সে অবশ্যই কুকুর অথবা বেড়ালের শরীর প্রাপ্ত হবে। কেউ যদি তার চেতনাকে দিব্য গুণাবলীতে ভূষিত করে, তা হলে সে দেবতাদের মতো শরীর প্রাপ্ত হবে এবং সে যদি কৃষ্ণভাবনাময় হয়, তা হলে সে অপ্রাকৃত কৃষ্ণলোকে স্থানান্তরিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করবে। দেহের নাশ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে দেহের সব কিছুরই নাশ হয়ে যায়, সেই ধারণা ভ্রান্ত। জীবাত্মা এক দেহ থেকে অন্য দেহে দেহান্তরিত হচ্ছে এবং তার বর্তমান শরীর ও বর্তমান কার্যকলাপ তার পরবর্তী শরীরের পটভূমি। কর্ম অনুসারে জীব একটি ভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হয় এবং যথা সময়ে তাকে সেই শরীর ত্যাগ করতে হয়। এখানে বলা হয়েছে যে, সূক্ষ্ম শরীর, যা পরবর্তী

শরীরের ধারণা বহন করে, তা পরবর্তী জীবনে অন্য একটি শরীরে বিকশিত হয়। এক দেহ থেকে অন্য দেহে দেহান্তরিত হবার এই পন্থা এবং দেহের সংগ্রামকে বলা হয় *কর্ষতি* বা জীবন-সংগ্রাম।

শ্লোক ৯

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ রসনং ঘ্রাণমেব চ ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯ ॥

শ্রোত্রম্—কর্ণ; **চক্ষুঃ**—চক্ষু; **স্পর্শনম্**—ত্বক; **চ**—ও; **রসনম্**—জিহ্বা; **ঘ্রাণম্**—ঘ্রাণশক্তি; **এব**—ও; **চ**—এবং; **অধিষ্ঠায়**—আশ্রয় করে; **মনঃ**—মন; **চ**—ও; **অয়ম্**—এই জীব; **বিষয়ান্**—ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ; **উপসেবতে**—উপভোগ করে।

গীতার গান

শরীরের অনুসার শ্রবণ দর্শন ।
স্পর্শন, রসন আর ঘ্রাণ বা মনন ॥
সে শরীরে জীব করে বিষয় সেবন ।
বদ্ধজীব করে সেই সংসার ভ্রমণ ॥

অনুবাদ

এই জীব চক্ষু, কর্ণ, ত্বক, জিহ্বা, নাসিকা ও মনকে আশ্রয় করে ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ উপভোগ করে।

তাৎপর্য

পক্ষান্তরে বলা যায়, জীব যদি তার চেতনাকে কুকুর-বেড়ালের প্রবৃত্তির দ্বারা কলুষিত করে তোলে, তা হলে পরবর্তী জীবনে সে কুকুর বা বেড়ালের মতো শরীর প্রাপ্ত হয়ে তাদের মতো দেহসুখ ভোগ করবে। চেতনা মূলত জলের মতো নির্মল। কিন্তু জলের সঙ্গে যদি কোন রং মেশান হয়, তা হলে জল রঙিন হয়ে যায়। অনুরূপভাবে, চেতনা নির্মল, কেন না আত্মা পবিত্র। কিন্তু জড়া প্রকৃতির গুণের সংস্রবে আসার ফলে চেতনা কলুষিত হয়ে পড়ে। প্রকৃত চেতনা হচ্ছে কৃষ্ণচেতনা। তাই কেউ যখন কৃষ্ণচেতনায় অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি তাঁর নির্মল জীবনে অবস্থান করেন। কিন্তু নানা রকম জাগতিক মনোবৃত্তির দ্বারা চেতনা যদি কলুষিত হয়ে

পড়ে, তা হলে পরবর্তী জীবনে তিনি তদনুরূপ দেহ প্রাপ্ত হন। তিনি যে পুনরায় মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হবেন, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তিনি কুকুর, বেড়াল, শূকর, দেবতা অথবা অন্য বহু শরীরের মধ্যে একটি শরীর প্রাপ্ত হতে পারেন। এই রকম চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন প্রকার প্রজাতির শরীর রয়েছে।

শ্লোক ১০

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্ ।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০ ॥

উৎক্রামন্তম্—দেহ ত্যাগ করে; **স্থিতম্**—দেহে স্থিত; **বা অপি**—দুটির মধ্যে কোন একটি; **ভুঞ্জানম্**—উপভোগ করে; **বা**—অথবা; **গুণান্বিতম্**—প্রকৃতির গুণের প্রভাবে আচ্ছন্ন; **বিমূঢ়াঃ**—মূঢ় লোকেরা; **ন**—না; **অনুপশ্যন্তি**—দেখতে পায়; **পশ্যন্তি**—দেখতে পান; **জ্ঞানচক্ষুষঃ**—জ্ঞান-চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

গীতার গান

মূঢ়লোক না বিচারে কি ভাবে কি হয় ।
উৎক্রান্তি স্থিতি ভোগ কার বা কোথায় ॥
যার জ্ঞানচক্ষু আছে গুরুর কৃপায় ।
ভাগ্যবান সেই জন দেখিবারে পায় ॥

অনুবাদ

মূঢ় লোকেরা দেখতে পায় না কিভাবে জীব দেহ ত্যাগ করে অথবা প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কিভাবে তার পরবর্তী শরীর সে উপভোগ করে। কিন্তু জ্ঞান-চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সমস্ত বিষয় দেখতে পান।

তাৎপর্য

জ্ঞানচক্ষুষঃ কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জ্ঞান বিনা কেউই বুঝতে পারে না কিভাবে জীব তার বর্তমান শরীরটি ত্যাগ করে এবং পরবর্তী জীবনে সে কি রকম শরীর ধারণ করে। এমন কি এটিও বুঝতে পারে না, কেন সে একটি বিশেষ ধরনের শরীরে অবস্থান করছে। এই তত্ত্বসমূহ উপলব্ধি করবার জন্য গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন, যা সদ্গুরুর মুখারবিন্দ থেকে *ভগবদ্গীতা* ও তদনুরূপ শাস্ত্র শ্রবণ করার

মাধ্যমে লাভ করা যায়। এই সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করার শিক্ষা যিনি লাভ করেছেন, তিনি অত্যন্ত ভাগ্যবান। প্রতিটি জীবই কোন বিশেষ অবস্থায় তার শরীর ত্যাগ করছে। কোন বিশেষ অবস্থায় সে জীবন ধারণ করছে এবং জড়া প্রকৃতির মোহে আচ্ছন্ন হয়ে সে বিশেষ অবস্থায় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার চেষ্টা করছে এবং পরিণামে সে নানা রকমের সুখ ও দুঃখ ভোগ করছে। যারা অনন্তকাল ধরে কাম ও বাসনার দ্বারা মোহিত হয়ে আছে, তারা কেন এক বিশেষ দেহে অবস্থান করছে এবং কেনই বা সেই দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহে দেহান্তরিত হচ্ছে তা উপলব্ধি করার সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলে। সেটি তাদের বোধগম্য হয় না। কিন্তু যাঁর হৃদয়ে দিব্যজ্ঞানের প্রকাশ হয়েছে, তিনি দর্শন করতে পারেন যে, আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন এবং সর্বদাই তাঁর দেহের পরিবর্তন হচ্ছে এবং চিন্ময় স্বরূপে তাঁর আত্মা নিত্য আনন্দ অনুভব করছে। এই জ্ঞান যিনি প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনিই বুঝতে পারেন, কিভাবে বদ্ধ জীব এই জড় জগতে দুর্দশা ভোগ করছে। সুতরাং, কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি সাধনের ফলে যাদের চেতনা খুব উন্নত হয়েছে, তাঁরা জনসাধারণকে এই জ্ঞান দান করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, কারণ বদ্ধ জীবের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা দেখে তাঁরা মর্মাহত হন। বদ্ধ জীবের অবস্থা অত্যন্ত ক্লেশদায়ক, তাই তাদের কর্তব্য হচ্ছে এই বদ্ধ অবস্থা অতিক্রম করে কৃষ্ণচেতনা লাভ করা এবং জড় জগতের বন্ধন থেকে নিজেদের মুক্ত করে অপ্রাকৃত জগতে প্রত্যাবর্তন করা।

শ্লোক ১১

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্ ।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১ ॥

যতন্তঃ—যত্নশীল; **যোগিনঃ**—যোগিগণ; **চ**—ও; **এনম্**—এই; **পশ্যন্তি**—দর্শন করতে পারেন; **আত্মনি**—আত্মায়; **অবস্থিতম্**—অবস্থিত; **যতন্তঃ**—যত্নপরায়ণ হয়ে; **অপি**—ও; **অকৃতাত্মানঃ**—আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান রহিত; **ন**—না; **এনম্**—এই; **পশ্যন্তি**—দেখতে পায়; **অচেতসঃ**—অবিবেকীগণ।

গীতার গান

কত যোগী বৈজ্ঞানিক চেষ্টা বহু করে ।
আত্মজ্ঞান অভাবেতে বৃথা ঘুরি মরে ॥

কিন্তু যেবা আত্মজ্ঞানী আত্মাবস্থিত ।
দেখিতে সমর্থ হয় শুদ্ধ অবহিত ॥

অনুবাদ

আত্মজ্ঞানে অধিষ্ঠিত যত্নশীল যোগিগণ, এই তত্ত্ব দর্শন করতে পারেন। কিন্তু আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান রহিত অবিবেকীগণ যত্নপরায়ণ হয়েও এই তত্ত্ব অবগত হয় না।

তাৎপর্য

আত্মজ্ঞান লাভের প্রয়াসী বহু সাধক আছেন। কিন্তু যে আত্মজ্ঞান লাভ করেনি, সে জীবদেহে সমস্ত কিছুর পরিবর্তন কিভাবে হচ্ছে তা দেখতে পায় না। এই সূত্রে *যোগিনঃ* কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। আধুনিক যুগে তথাকথিত অনেক যোগী আছে এবং তথাকথিত বহু যোগাশ্রম আছে। কিন্তু আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানের ব্যাপারে তারা বাস্তবিকই অন্ধ। তারা কেবল এক ধরনের শরীরচর্চা প্রণালী সংক্রান্ত ব্যায়ামে অভ্যস্ত এবং দেহ যদি সুস্থ-সুন্দর থাকে, তা হলেই তারা সন্তুষ্ট হয়। এ ছাড়া আর অন্য কোন তথ্য তাদের জানা নেই। তাদের বলা হয় *যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানঃ*। যদিও তারা তথাকথিত যোগ পন্থায় প্রচেষ্টা করছে, কিন্তু তারা তত্ত্বজ্ঞানী নয়। এই ধরনের লোকেরা আত্মার দেহান্তর সম্বন্ধে কিছুই বুঝতে পারে না। যাঁরা যথার্থ যোগপন্থা অনুসরণ করছেন, তাঁরাই কেবল আত্মা, জগৎ ও পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কৃষ্ণভাবনায় শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তিতে নিযুক্ত ভক্তিযোগীই কেবল উপলব্ধি করতে পারেন কিভাবে সব কিছু ঘটছে।

শ্লোক ১২

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ ভাসয়তেঽখিলম্ ।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥ ১২ ॥

যৎ—যে; **আদিত্যগতম্**—সূর্যস্থিত; **তেজঃ**—জ্যোতি; **জগৎ**—বিশ্বকে; **ভাসয়তে**—প্রকাশিত করে; **অখিলম্**—সমগ্র; **যৎ**—যে; **চন্দ্রমসি**—চন্দ্রে; **যৎ**—যে; **চ**—ও; **অগ্নৌ**—অগ্নিতে; **তৎ**—সেই; **তেজঃ**—তেজ; **বিদ্ধি**—জানবে; **মামকম্**—আমার।

গীতার গান

এই যে সূর্যের তেজ অখিল জগতে ।
চন্দ্রের কিরণ কিংবা আছে ভালমতে ॥

আমার প্রভাব সেই আভাস সে হয় ।
আমি যাকে আলো দিই সে আলো পায় ॥

অনুবাদ

সূর্যের যে জ্যোতি এবং চন্দ্র ও অগ্নির যে জ্যোতি সমগ্র জগতকে উদ্ভাসিত করে, তা আমারই তেজ বলে জানবে।

তাৎপর্য

যারা নির্বোধ, তারা বুঝতে পারে না কিভাবে সব কিছু ঘটছে। ভগবান এখানে যা ব্যাখ্যা করেছেন, তা উপলব্ধি করার মাধ্যমেই যথার্থ জ্ঞানের সূচনা হয়। সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি ও বৈদ্যুতিক শক্তি সকলেই দেখতে পায়। মানুষকে কেবল এটি বুঝতে চেষ্টা করতে হবে যে, সূর্যের উজ্জ্বল জ্যোতি, চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণ, বৈদ্যুতিক আলোক ও অগ্নির দীপ্তি সবই আসছে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের থেকে। জীবনের এই ভাবধারায়, কৃষ্ণভাবনার সূচনা এই জড় জগতে বদ্ধ জীবের প্রগতি অনেক অংশে নির্ভর করে। জীব অপরিহার্যরূপে পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য বিভিন্ন অংশ এবং এখানে তিনি ইঙ্গিত দিচ্ছেন কিভাবে তারা তাদের আপন আলয় ভগবৎ-ধামে ফিরে যেতে পারে।

এই শ্লোকটির মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, সূর্য সমস্ত সৌরমণ্ডলকে আলোকিত করছে। অনেক অনেক ব্রহ্মাণ্ড আছে এবং সৌরমণ্ডল আছে, যেখানে ভিন্ন ভিন্ন সূর্য রয়েছে, চন্দ্র রয়েছে এবং গ্রহ রয়েছে। তবে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে একটি মাত্র সূর্যই আছে। *ভগবদ্গীতায়* (১০/২১) বলা হয়েছে যে, চন্দ্র হচ্ছে নক্ষত্রদের মধ্যে অন্যতম (*নক্ষত্রাণামহং শশী*)। সূর্যরশ্মির প্রকাশ হয় চিদাকাশে ভগবানের চিন্ময় জ্যোতির প্রভাবে। সূর্যোদয়ের সঙ্গে মানুষের কার্যকলাপ বিন্যস্ত করা হয়েছে। আগুন জ্বালিয়ে তারা রান্না করে, আগুন জ্বালিয়ে তারা কারখানা চালায় ইত্যাদি। আগুনের সাহায্যে কত কিছু করা হয়, তাই সূর্যোদয়, অগ্নি ও চন্দ্রকিরণ জীবদের কাছে এত মনোরম। তাদের সাহায্য ব্যতীত জীব বেঁচে থাকতে পারে না। তাই কেউ যখন বুঝতে পারে যে, সূর্য, চন্দ্র, অগ্নির আলোক ও জ্যোতির উৎস হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তখন তার কৃষ্ণচেতনা শুরু হয়। চন্দ্র-কিরণের দ্বারা সমস্ত বনস্পতির পুষ্টিসাধন হয়। চন্দ্রকিরণ এতই মনোরম যে, মানুষ অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারে যে, তারা পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপার ফলেই জীবন ধারণ করছে। তাঁর কৃপা ব্যতীত সূর্যের উদয় হতে পারে

না, তাঁর কৃপা ব্যতীত চন্দ্রের প্রকাশ হতে পারে না, তাঁর কৃপা ব্যতীত অগ্নির প্রকাশ হতে পারে না এবং সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নির সহায়তা ব্যতীত কেউই বাঁচতে পারে না। এই চিন্তাগুলি বদ্ধ জীবের কৃষ্ণচেতনা জাগিয়ে তোলে।

শ্লোক ১৩

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা ।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥ ১৩ ॥

গাম্—পৃথিবীতে; **আবিশ্য**—প্রবিষ্ট হয়ে; **চ**—ও; **ভূতানি**—জীবসমূহকে; **ধারয়ামি**—ধারণ করি; **অহম্**—আমি; **ওজসা**—আমার শক্তির দ্বারা; **পুষ্ণামি**—পুষ্ট করছি; **চ**—এবং; **ঔষধীঃ**—ধান, যব আদি ওষধি; **সর্বাঃ**—সমস্ত; **সোমঃ**—চন্দ্র; **ভূত্বা**—হয়ে; **রসাত্মকঃ**—রসময়।

গীতার গান

এই যে পৃথিবী যথা বায়ুমধ্যে ভাসে ।
আমার সে শক্তি ধরে সবেতে প্রবেশে ॥
আমি সে ঔষধি যত পোষণ করিতে ।
চন্দ্ররূপে রশ্মিদান করি সে তাহাতে ॥

অনুবাদ

আমি পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হয়ে আমার শক্তির দ্বারা সমস্ত জীবদের ধারণ করি এবং রসাত্মক চন্দ্ররূপে ধান, যব আদি ওষধি পুষ্ট করছি।

তাৎপর্য

ভগবানের শক্তির প্রভাবেই যে সমস্ত গ্রহগুলি মহাশূন্যে ভাসছে, তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। ভগবান প্রতিটি অণুতে, প্রতিটি গ্রহে এবং প্রতিটি জীবে প্রবিষ্ট হন। *ব্রহ্মসংহিতাতে* সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের অংশরূপে পরমাত্মা গ্রহগুলিতে, ব্রহ্মাণ্ডে, জীবে, এমন কি অণুতে প্রবিষ্ট হন। সুতরাং, তিনি প্রবিষ্ট হন বলেই সব কিছু যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়। দেহে যখন আত্মা থাকে, তখন মানুষ জলে ভেসে থাকতে পারে, কিন্তু আত্মা যখন এই দেহ থেকে চলে যায় এবং দেহটির যখন মৃত্যু হয়, তখন দেহটি ডুবে যায়। অবশ্যই সেটি যখন পরে পচে ফেঁপে-ফুলে ওঠে, তখন তা

শুকনো খড়কুটা বা পাতার মতো ভাসতে থাকে, কিন্তু যেইমাত্র মানুষটির মৃত্যু হয়, সে তৎক্ষণাৎ জলে ডুবে যায়। তেমনই এই সমস্ত গ্রহগুলি মহাশূন্যে ভাসছে এবং তা সম্ভব হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের পরম শক্তি তাতে প্রবিষ্ট হয়েছে বলে। তাঁর শক্তি সমস্ত গ্রহগুলিকে এক মুঠো ধূলিকণার মতো ধারণ করে আছে। কেউ যদি এক মুঠো ধূলিকণা ধরে রাখে, তা হলে সেই ধূলিকণাগুলি পড়ে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু কেউ যদি সেগুলিকে বায়ুর মধ্যে নিক্ষেপ করে, তা হলে তা পড়ে যাবে। তেমনই, এই সমস্ত গ্রহগুলি যা মহাশূন্যে ভাসছে, তা প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের বিশ্বরূপের মুষ্টিতে ধৃত। তাঁর বীর্য ও শক্তির প্রভাবে স্থাবর-জঙ্গম সব কিছুই তাদের যথাস্থানে অবস্থিত থাকে। বৈদিক মন্ত্রে বলা হয়েছে যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের জন্যই সূর্য আলোক দান করছে এবং গ্রহগুলি নির্দিষ্ট গতিতে ঘুরে চলেছে। তিনি না হলে ধূলিকণার মতো সমস্ত গ্রহগুলি মহাশূন্যে বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ত এবং বিনাশ প্রাপ্ত হত। তেমনই, চন্দ্র যে সমস্ত বনস্পতির পুষ্টি সাধন করছে, তাও পরম পুরুষোত্তম ভগবানেরই জন্য। চন্দ্রের প্রভাবের ফলেই বনস্পতিরা সুস্বাদু হয়। চন্দ্রকিরণ ব্যতীত বনস্পতিরা না পারে বর্ধিত হতে, না পারে রসাল স্বাদযুক্ত হতে। মানব-সমাজ কর্ম করছে, আরাম উপভোগ করছে এবং আহার্যের স্বাদ উপভোগ করছে, পরমেশ্বর ভগবান সেগুলি সরবরাহ করছেন বলেই। তা না হলে মানুষ বাঁচতে পারত না। *রসাত্মকঃ* কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি চন্দ্রের প্রভাবে সব কিছু সুস্বাদু হয়ে ওঠে।

শ্লোক ১৪

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্ ॥ ১৪ ॥

অহম্—আমি; **বৈশ্বানরঃ**—জঠরাগ্নি; **ভূত্বা**—হয়ে; **প্রাণিনাম্**—প্রাণীগণের; **দেহম্**—দেহ; **আশ্রিতঃ**—আশ্রয় করে; **প্রাণ**—প্রাণবায়ু; **অপান**—অপান বায়ু; **সমাযুক্তঃ**—সংযোগে; **পচামি**—পরিপাক করি; **অন্নম্**—খাদ্য; **চতুর্বিধম্**—চার প্রকার।

গীতার গান

আমি বৈশ্বানর হই দেহমাত্রে বসি ।
প্রাণাপান বায়ুযোগে ভক্ষ্য দ্রব্য কষি ॥

অনুবাদ

আমি জঠরাগ্নি রূপে প্রাণীগণের দেহ আশ্রয় করে প্রাণ ও অপান বায়ুর সংযোগে চার প্রকার খাদ্য পরিপাক করি।

তাৎপর্য

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, জঠরে এক রকমের অগ্নি আছে যা সমস্ত খাদ্যদ্রব্যকে হজম করতে সাহায্য করে। সেই অগ্নি যখন প্রজ্বলিত না থাকে, তখন ক্ষুধা থাকে না এবং সেই অগ্নি যখন ঠিকমতো জ্বলতে থাকে, তখন আমরা ক্ষুধার্ত হই। মাঝে মাঝে সেই অগ্নি যখন ঠিকমতো না জ্বলে, তখন চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। সে যাই হোক, এই অগ্নি হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতিনিধি। বৈদিক মন্ত্রেও (*বৃহদারণ্যক উপনিষদ* ৫/৯/১) প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান বা ব্রহ্ম অগ্নিরূপে উদরে অবস্থিত হয়ে সব রকমের খাদ্যদ্রব্য পরিপাক করছেন (*অয়মগ্নির্বৈশ্বানরো যোঽয়মন্তঃপুরুষে যেনেদং অন্নং পচ্যতে*)। সুতরাং, যেহেতু তিনি সব রকমের খাদ্যদ্রব্য পরিপাক করতে সাহায্য করছেন, তাই আহারের ব্যাপারেও জীব স্বাধীন নয়। পরমেশ্বর ভগবান যদি পরিপাকের ব্যাপারে তাকে সাহায্য না করেন, তা হলে তার পক্ষে আহার করার কোন সম্ভাবনা থাকে না। এভাবেই তিনি খাদ্যশস্য উৎপাদন করেন এবং পরিপাক করেন এবং তাঁর কৃপার প্রভাবে আমরা আমাদের জীবন উপভোগ করতে পারি। *বেদান্তসূত্রেও* (১/২/২৭) সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে, *শব্দাদিভ্যোঽন্তঃ প্রতিষ্ঠানাচ্চ*—ভগবান শব্দের মধ্যে ও শরীরের মধ্যে, বায়ুতে এমন কি উদরে পরিপাক শক্তিরূপে অধিষ্ঠিত। খাদ্যদ্রব্য চার প্রকারের—চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় এবং এই সব রকমের খাদ্যেরই পরিপাক করার শক্তি হচ্ছেন তিনি।

শ্লোক ১৫

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ॥ ১৫ ॥

সর্বস্য—সমস্ত জীবের; **চ**—এবং; **অহম্**—আমি; **হৃদি**—হৃদয়ে; **সন্নিবিষ্টঃ**—অবস্থিত; **মত্তঃ**—আমার থেকে; **স্মৃতিঃ**—স্মৃতি; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **অপোহনম্**—

বিলোপ; **চ**—এবং; **বেদৈঃ**—বেদসমূহের দ্বারা; **চ**—ও; **সর্বৈঃ**—সমস্ত; **অহম্**—আমি; **এব**—অবশ্যই; **বেদ্যঃ**—জ্ঞাতব্য; **বেদান্তকৃৎ**—বেদান্তকর্তা; **বেদবিৎ**—বেদজ্ঞ; **এব**—অবশ্যই; **চ**—এবং; **অহম্**—আমি।

গীতার গান

সবার হৃদয়ে আমি, সন্নিবিষ্ট অন্তর্যামী,
আমা হতে স্মৃতি জ্ঞান মন ।
আমি সে জাগাই কারে, আমি সে ভুলাই তারে,
আমা হতে হয় অপোহন ॥
যত বেদ পৃথিবীতে, আমার সে তল্লাসেতে,
আমি হই সব বেদবেদ্য ।
আমি সে বেদান্তবিৎ, আমি সে বেদান্তকৃৎ,
বেদান্তের কথা শুন অদ্য ॥

অনুবাদ

আমি সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থিত এবং আমার থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান ও বিলোপ হয়। আমিই সমস্ত বেদের জ্ঞাতব্য এবং আমিই বেদান্তকর্তা ও বেদবিৎ।

তাৎপর্য

ভগবান পরমাত্মারূপে সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করেন এবং তাঁর থেকে সমস্ত কর্মের সূচনা হয়। জীব তার পূর্ব জীবনের সব কথা ভুলে যায়, কিন্তু তাকে সমস্ত কর্মের সাক্ষী পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ অনুসারে কর্ম করে যেতে হয়। সুতরাং, তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে সে কর্ম করতে শুরু করে। সেই জন্য যে জ্ঞানের প্রয়োজন ভগবান তাকে তা দান করেন। তিনি তাকে স্মৃতি দান করেন এবং তার পূর্ব জীবন সম্বন্ধে বিস্মৃতিও দান করেন। এভাবেই, ভগবান কেবল সর্বব্যাপ্তই নন, তিনি প্রতিটি জীবের অন্তরেও বিরাজমান। তিনি নানা রকম কর্মফল দান করেন। তিনি নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান রূপে বা হৃদয়ে অবস্থিত পরমাত্মা রূপেই কেবল আরাধ্য নন, *বেদের* অবতাররূপেও তিনি আরাধ্য। *বেদ* মানুষকে সঠিক নির্দেশ প্রদান করে, যাতে তারা যথাযথভাবে তাদের জীবনকে গড়ে তুলতে পারে এবং তাদের প্রকৃত আলয় ভগবৎ-ধামে ফিরে যেতে পারে। *বেদ* পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে জ্ঞান দান করে এবং শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেব রূপে অবতীর্ণ হয়ে *বেদান্তসূত্র* প্রণয়ন করেন। ব্যাসদেবের *বেদান্তসূত্রের* ভাষ্য

শ্রীমদ্ভাগবতই হচ্ছে *বেদান্তসূত্রের* যথার্থ তত্ত্ব-উপলব্ধি। পরমেশ্বর ভগবান এতই পূর্ণ যে, বদ্ধ জীবের উদ্ধারের জন্য তিনি হচ্ছেন তার খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহকারী, পাচনকারী, তার কর্মের সাক্ষী, *বেদরূপে* তার জ্ঞান প্রদাতা এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে *ভগবদ্গীতার* শিক্ষক। তিনি বদ্ধ জীবাত্মার আরাধ্য। এভাবেই ভগবান সর্ব মঙ্গলময় এবং তিনি পরম দয়াময়।

অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্। দেহ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে জীব সব কিছু ভুলে যায়। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সে আবার তার কর্ম শুরু করে। যদিও সে তার পূর্বজন্মের সব কথা ভুলে যায়, তবুও যেখানে সে তার কর্ম শেষ করেছিল, সেখান থেকে আবার শুরু করবার জন্য ভগবান তাকে বুদ্ধি দান করেন। সুতরাং, হৃদয়ে অবস্থিত পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ অনুসারে জীব যে কেবল জাগতিক সুখ-দুঃখ ভোগ করে তা নয়, তার কাছ থেকে বৈদিক জ্ঞান উপলব্ধি করার সুযোগও সে পায়। কেউ যদি বৈদিক জ্ঞান লাভে গভীরভাবে প্রয়াসী হয়, তা হলে শ্রীকৃষ্ণ তাকে উপযুক্ত বুদ্ধিও দান করেন। আমাদের উপলব্ধির জন্য কেন তিনি বৈদিক জ্ঞান দান করেছেন? কারণ, ব্যক্তিগতভাবে শ্রীকৃষ্ণকে জানা জীবের প্রয়োজন। বৈদিক শাস্ত্রে সেই সম্বন্ধে প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—*যোঽসৌ সর্বৈর্বেদৈর্গীয়তে।* *চতুর্বেদ থেকে শুরু করে বেদান্তসূত্র, উপনিষদ, পুরাণ* আদি সমস্ত শাস্ত্রে পরমেশ্বর ভগবানের যশ কীর্তিত হয়েছে। বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান অনুশীলন করার ফলে, বৈদিক দর্শন আলোচনা করার ফলে এবং ভক্তিযোগে ভগবানের আরাধনা করার ফলে তাঁকে লাভ করা যায়। সুতরাং, *বেদের* উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে জানা। *বেদ* আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করার নির্দেশ দেয় এবং পথ প্রদর্শন করে। পরম পুরুষোত্তম ভগবান হচ্ছেন পরম লক্ষ্য। সেই কথা প্রতিপন্ন করে *বেদান্তসূত্র* (১/১/৪) বলছে—*তৎ তু সমন্বয়াৎ।* তিনটি পর্যায়ে পরিপূর্ণতা অর্জন করা যায়। বৈদিক শাস্ত্র উপলব্ধি করার মাধ্যমে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কের কথা জানতে পারা যায়, বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে ভগবানের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় এবং অবশেষে জীবনের পরম লক্ষ্য পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে উপনীত হওয়া যায়। এই শ্লোকে *বেদের* উদ্দেশ্য, *বেদের* উপলব্ধি এবং *বেদের* লক্ষ্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৬

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬ ॥

দ্বৌ—দুই; **ইমৌ**—এই; **পুরুষৌ**—জীব; **লোকে**—জগতে; **ক্ষরঃ**—বিনাশী; **চ**—এবং; **অক্ষরঃ**—অবিনাশী; **এব**—অবশ্যই; **চ**—এবং; **ক্ষরঃ**—বিনাশী; **সর্বাণি**—সমস্ত; **ভূতানি**—জীব; **কূটস্থঃ**—একভাবে স্থিত; **অক্ষরঃ**—অবিনাশী; **উচ্যতে**—বলা হয়।

গীতার গান

বদ্ধ মুক্ত পুরুষ সে হয় দ্বি-প্রকার ।
দুই নামে পরিচিত সে ক্ষর অক্ষর ॥
বদ্ধ জীব যত হয় তার ক্ষর নাম ।
অক্ষর কূটস্থ জীব নিত্য মুক্তধাম ॥

অনুবাদ

ক্ষর ও অক্ষর দুই প্রকার জীব রয়েছে। এই জড় জগতের সমস্ত জীবকে ক্ষর এবং চিৎ-জগতের সমস্ত জীবকে অক্ষর বলা হয়।

তাৎপর্য

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, ব্যাসদেব রূপে অবতরণ করে ভগবান *বেদান্তসূত্র* প্রণয়ন করেন। এখানে ভগবান সংক্ষেপে *বেদান্তসূত্রের* সারমর্ম বর্ণনা করেছেন। তিনি বলছেন যে, জীব যা সংখ্যায় অনন্ত, তাদের দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—ক্ষর ও অক্ষর। জীব হচ্ছে ভগবানের সনাতন বিভিন্নাংশ। তারা যখন জড় জগতের সংস্পর্শে থাকে, তখন তাদের বলা হয় *জীবভূত* এবং সংস্কৃত *ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি* কথাটির অর্থ হচ্ছে তারা *ক্ষর*। কিন্তু যাঁরা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সঙ্গে একাত্মভাবে যুক্ত, তাঁদের বলা হয় *অক্ষর*। একাত্মভাবে যুক্ত কথাটির অর্থ এই নয় যে, তাঁদের কোন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য নেই, কিন্তু তার অর্থ হচ্ছে যে, তাঁরা ভগবানের থেকে বিচ্ছিন্ন নন। সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে তাঁরা সকলেই মেনে নিয়েছেন। অবশ্য, চিৎ-জগতে সৃষ্টি বলে কিছু নেই, তবে *বেদান্তসূত্রের* বর্ণনা অনুসারে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টির উৎস, তাই সেই ধারণাই এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা অনুসারে দুই রকমের জীব আছে। *বেদেও* তার প্রমাণ আছে। সুতরাং, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই। যে সমস্ত জীব এই জগতে মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয় নিয়ে সংগ্রাম করছে, তাদের জড় দেহ আছে, যা তাদের বদ্ধ অবস্থায় প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে। জীব যতক্ষণ বদ্ধ থাকে, জড়ের সংস্পর্শে আসার ফলে তার দেহের পরিবর্তন হয়। জড় দেহের পরিবর্তন

হয়, তাই মনে হয় যেন জীবের পরিবর্তন হচ্ছে। কিন্তু চিৎ-জগতে জড় পদার্থ দিয়ে শরীর তৈরি হয় না। তাই সেখানে কোন পরিবর্তন নেই। জড় জগতে জীবের ছয়টি পরিবর্তন হয়—জন্ম, বৃদ্ধি, স্থিতি, বংশবৃদ্ধি, ক্ষয় ও বিনাশ। এগুলি জড় শরীরের পরিবর্তন। কিন্তু চিৎ-জগতে দেহের কোন পরিবর্তন হয় না। সেখানে জরা নেই, জন্ম নেই এবং মৃত্যু নেই। সেখানে সব কিছুই একত্বভাবে অবস্থান করে। *ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি*—পিতামহ ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি ছোট পিঁপড়ে পর্যন্ত যে এই জড় জগতের সংস্পর্শে এসেছে, তারা সকলেই দেহ পরিবর্তন করছে। তাই তারা সকলেই *ক্ষর*। চিৎ-জগতে সকলেই একত্বভাবে সর্বদা *অক্ষর* বা মুক্ত।

শ্লোক ১৭

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥

উত্তমঃ—উত্তম; **পুরুষঃ**—পুরুষ; **তু**—কিন্তু; **অন্যঃ**—অন্য; **পরম**—পরম; **আত্মা**—আত্মা; **ইতি**—এভাবে; **উদাহৃতঃ**—বলা হয়; **যঃ**—যিনি; **লোক**—ভুবনে; **ত্রয়ম্**—তিন; **আবিশ্য**—প্রবিষ্ট হয়ে; **বিভর্তি**—পালন করছেন; **অব্যয়ঃ**—অব্যয়; **ঈশ্বরঃ**—ঈশ্বর।

গীতার গান

তাহা হতে যে উত্তম পুরুষ প্রধান ।
ঈশ্বর সে পরমাত্মা থাকে সর্বস্থান ॥

অনুবাদ

এই উভয় থেকে ভিন্ন উত্তম পুরুষকে বলা হয় পরমাত্মা, যিনি ঈশ্বর ও অব্যয় এবং ত্রিজগতের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে পালন করছেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটির ধারণা *কঠ উপনিষদ* (২/২/১৩) ও *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে* (৬/১৩) খুব সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, বদ্ধ ও মুক্ত অনন্ত কোটি জীবের ঊর্ধ্বে হচ্ছেন পরম পুরুষ, যিনি হচ্ছেন পরমাত্মা। *উপনিষদের* শ্লোকটি হচ্ছে—*নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্*। এর তাৎপর্য হচ্ছে যে, বদ্ধ ও মুক্ত উভয় প্রকার জীবের মধ্যেই একজন পরম প্রাণময় পুরুষ রয়েছেন। তিনি

হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান, যিনি তাদের প্রতিপালন করেন এবং তাদের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম অনুসারে আনন্দ উপভোগ করবার সমস্ত সুযোগ সুবিধা দান করেন। সেই পরম পুরুষোত্তম ভগবান সকলের হৃদয়ে পরমাত্মা রূপে অবস্থান করেন। যে জ্ঞানী পুরুষ তাঁকে উপলব্ধি করতে পারেন, তিনিই কেবল যথার্থ শান্তি লাভের যোগ্য, অন্য কেউ নয়।

শ্লোক ১৮

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮ ॥

যস্মাৎ—যেহেতু; **ক্ষরম্**—ক্ষরের; **অতীতঃ**—অতীত; **অহম্**—আমি; **অক্ষরাৎ**—অক্ষর থেকে; **অপি**—ও; **চ**—এবং; **উত্তমঃ**—উত্তম; **অতঃ**—অতএব; **অস্মি**—হই; **লোকে**—জগতে; **বেদে**—বৈদিক শাস্ত্রে; **চ**—এবং; **প্রথিতঃ**—বিখ্যাত; **পুরুষোত্তমঃ**—পুরুষোত্তম নামে।

গীতার গান

ক্ষর বা অক্ষর হতে আমি সে উত্তম ।
অতএব ঘোষিত নাম পুরুষোত্তম ॥

অনুবাদ

যেহেতু আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর থেকেও উত্তম, সেই হেতু জগতে ও বেদে আমি পুরুষোত্তম নামে বিখ্যাত।

তাৎপর্য

পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কেউই অতিক্রম করতে পারে না—বদ্ধ জীবেও না, মুক্ত জীবেও না। অতএব, তিনি হচ্ছেন পুরুষদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তম পুরুষ। এখন স্পষ্টভাবে এখানে বোঝা যাচ্ছে যে, জীব ও পরম পুরুষোত্তম ভগবান উভয়েই স্বতন্ত্র। পার্থক্যটি হচ্ছে যে, বদ্ধ অবস্থাতেই হোক অথবা মুক্ত অবস্থাতেই হোক, জীবেরা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিসমূহকে কোন পরিমাণেই অতিক্রম করতে পারে না। পরমেশ্বর ভগবান ও জীবকে সমপর্যায়ভুক্ত বা সর্বতোভাবে সমান বলে মনে করা ভুল। তাঁদের ব্যক্তিসত্তায় সর্বদাই ঊর্ধ্বতন ও অধস্তনের প্রশ্ন থেকে যায়। উত্তম শব্দটি এখানে খুব তাৎপর্যপূর্ণ। পরমেশ্বর ভগবানকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না।

লোকে কথাটির তাৎপর্য হচ্ছে '*পৌরুষ আগমে*' (স্মৃতিশাস্ত্র)। নিরুক্তি অভিধানে প্রতিপন্ন করা হয়েছে, *লোক্যতে বেদার্থোঽনেন*—"*বেদের* উদ্দেশ্য স্মৃতি শাস্ত্রে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।"

পরমেশ্বর ভগবান তাঁর পরমাত্মারূপী প্রাদেশিক প্রকাশরূপে *বেদেও* বর্ণিত হয়েছেন। *বেদে* (*ছান্দোগ্য উপনিষদ* ৮/১২/৩) নিম্নলিখিত শ্লোকটি উল্লেখ করা হয়েছে—*তাবদেষ সংপ্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপং সংপদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ*। "দেহ থেকে বেরিয়ে এসে পরমাত্মা নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে প্রবেশ করেন। তখন তিনি তাঁর চিন্ময় স্বরূপে অবস্থান করেন। সেই পরম ঈশ্বরকে বলা হয় পরম পুরুষ।" অর্থাৎ, পরম পুরুষ তাঁর চিন্ময় জ্যোতি প্রদর্শন ও বিকিরণ করেন, যা হচ্ছে পরম জ্যোতি। সেই পরম পুরুষোত্তমই পরমাত্মা রূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন। সত্যবতী ও পরাশরের সন্তান ব্যাসদেব রূপে অবতীর্ণ হয়ে তিনি বৈদিক জ্ঞান দান করেছেন।

শ্লোক ১৯

যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্ ।
স সর্ববিদ্ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥ ১৯ ॥

যঃ—যিনি; **মাম্**—আমাকে; **এবম্**—এভাবে; **অসংমূঢ়ঃ**—নিঃসন্দেহে; **জানাতি**—জানেন; **পুরুষোত্তমম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **সঃ**—তিনি; **সর্ববিৎ**—সর্বজ্ঞ; **ভজতি**—ভজনা করেন; **মাম্**—আমাকে; **সর্বভাবেন**—সর্বতোভাবে; **ভারত**—হে ভারত।

গীতার গান

যে মোরে বুঝিল শ্রেষ্ঠ সে পুরুষোত্তম ।
সকল সন্দেহ ছাড়ি হইল উত্তম ॥
সে জানিল সর্ব বেদ নির্মল হৃদয় ।
হে ভারত! সর্বভাবে সে মোরে ভজয় ॥

অনুবাদ

হে ভারত! যিনি নিঃসন্দেহে আমাকে পুরুষোত্তম বলে জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ এবং তিনি সর্বতোভাবে আমাকে ভজনা করেন।

তাৎপর্য

পরমতত্ত্ব ও জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে নানা রকম দার্শনিক অনুমান আছে। এখন এই শ্লোকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, যিনি জানেন শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষ, তিনি প্রকৃতপক্ষে সর্বজ্ঞ। যে অনভিজ্ঞ, সে পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে কেবল অনুমানই করে চলে, কিন্তু যথার্থ জ্ঞানী তাঁর অমূল্য সময়ের অপচয় না করে সরাসরিভাবে কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্তিতে নিজেকে নিযুক্ত করেন। সমগ্র *ভগবদ্গীতায়* সর্বত্রই এই তত্ত্বের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু তবুও *ভগবদ্গীতার* বহু উদ্ধত হঠকারী ভাষ্যকারেরা মনে করে যে, পরমতত্ত্ব ও জীব এক ও অভিন্ন।

বৈদিক জ্ঞানকে বলা হয় *শ্রুতি* অর্থাৎ শ্রবণের মাধ্যমে শিক্ষা। প্রামাণিক সূত্র শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর প্রতিনিধির কাছ থেকেই কেবল বৈদিক জ্ঞান লাভ করা উচিত। এখানে শ্রীকৃষ্ণ খুব সুন্দরভাবে সব কিছুর পার্থক্য বর্ণনা করেছেন এবং এই সূত্র থেকে সকলেরই শ্রবণ করা উচিত। নির্বোধের মতো কেবল শ্রবণ করাই যথেষ্ট নয়, সাধু, গুরু, বৈষ্ণবের কৃপা লাভ করে তা উপলব্ধি করতে হবে। এমন নয় যে, কেবল কেতাবি বিদ্যার উপর নির্ভর করে শুধুমাত্র অনুমান করলেই চলবে। বিনীতভাবে *ভগবদ্গীতা* থেকে শ্রবণ করতে হবে যে, জীব সর্বদাই পরম পুরুষ ভগবানের অধীন তত্ত্ব। পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা অনুসারে যিনি এই তত্ত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনিই *বেদের* যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হতে পেরেছেন, তা ছাড়া আর কেউই *বেদের* উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত নয়।

ভজতি শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরমেশ্বর ভগবানের সেবা সম্পর্কে অনেক জায়গায় *ভজতি* শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে। কেউ যখন পূর্ণ কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ভগবদ্ভক্তিতে নিযুক্ত হন, তখন বুঝতে হবে যে, তিনি ইতিমধ্যেই সমস্ত বৈদিক জ্ঞান উপলব্ধি করতে পেরেছেন। বৈষ্ণব পরম্পরায় বলা হয় যে, কেউ যখন ভক্তিযোগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হন, তখন তাঁকে পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করার জন্য অন্য কোন আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া অনুশীলন করতে হয় না। তিনি ইতিমধ্যেই সেই স্তরে উপনীত হয়েছেন, কারণ তিনি ভক্তিযোগে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত। তাঁর পক্ষে ভগবৎ-তত্ত্ব উপলব্ধির সব কয়টি প্রারম্ভিক প্রক্রিয়ার সমাপ্তি হয়েছে। কিন্তু কেউ যদি শত সহস্র জীবন ধরে ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে কেবল অনুমান করে শ্রীকৃষ্ণকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান রূপে উপলব্ধির পর্যায়ে উপনীত না হয় এবং তার শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করতে না পারে, তা হলে বহু বর্ষ ধরে তার যে এত সমস্ত অনুমান, তা কেবল সময়েরই অপচয় মাত্র।

শ্লোক ২০

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ ।
এতদ্ বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০ ॥

ইতি—এভাবেই; **গুহ্যতমম্**—সবচেয়ে গোপনীয়; **শাস্ত্রম্**—শাস্ত্র; **ইদম্**—এই; **উক্তম্**—কথিত হল; **ময়া**—আমার দ্বারা; **অনঘ**—হে নিষ্পাপ; **এতৎ**—এই; **বুদ্ধা**—অবগত হয়ে; **বুদ্ধিমান্**—বুদ্ধিমান; **স্যাৎ**—হন; **কৃতকৃত্যঃ**—কৃতার্থ; **চ**—এবং; **ভারত**—হে ভারত।

গীতার গান

এই সে শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম কথা শুন ।
তুমি সে নিষ্পাপ হও শুদ্ধ তব মন ॥
ইহা যে বুঝিল ভাগ্যে হল বুদ্ধিমান ।
হে ভারত! কৃতকৃত্য সে হল মহান ॥

অনুবাদ

হে নিষ্পাপ অর্জুন! হে ভারত! এভাবেই সবচেয়ে গোপনীয় শাস্ত্র আমি তোমার কাছে প্রকাশ করলাম। যিনি এই তত্ত্ব অবগত হয়েছেন, তিনি প্রকৃত বুদ্ধিমান ও কৃতার্থ হন।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, এটিই হচ্ছে সমস্ত দিব্য শাস্ত্রের সারমর্ম এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবান যেভাবে তা দান করেছেন, ঠিক সেভাবেই তা উপলব্ধি করা উচিত। তার ফলে মানুষের বুদ্ধি বিকশিত হবে এবং সে পূর্ণরূপে দিব্য জ্ঞান উপলব্ধি করতে পারবে। পক্ষান্তরে বলা যায়, এই ভগবৎ-দর্শন উপলব্ধি করার ফলে এবং ভক্তিযোগে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হওয়ার ফলে সকলেই জড়া প্রকৃতির গুণের কলুষতা থেকে মুক্ত হতে পারে। ভক্তিযোগ হচ্ছে পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান লাভের পন্থা। যেখানেই ভক্তিযোগ সাধিত হয়, সেখানে জড় জগতের কলুষতা থাকতে পারে না। ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা এবং ভগবান এক ও অভিন্ন, কারণ তাঁরা চিন্ময়। ভগবানের সেবা অনুষ্ঠিত হয় পরমেশ্বর ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির মাধ্যমে। ভগবানকে বলা হয় সূর্যের মতো এবং অজ্ঞানতা হচ্ছে অন্ধকার। যেখানে সূর্যালোকের প্রকাশ হয়, সেখানে অন্ধকারের কোন প্রশ্নই উঠতে

পারে না। তাই, সদ্‌গুরুর উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে যখন ভক্তিযোগের অনুশীলন করা হয়, তখন অজ্ঞানতার কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না।

সকলেরই উচিত এই কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনে ব্রতী হওয়া এবং বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ও নির্মলতা প্রাপ্তির জন্য ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হওয়া। যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ কৃষ্ণ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করছে এবং ভক্তিযোগে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হচ্ছে, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে সে যতই বুদ্ধিমান হোক না কেন, সে যথার্থ বুদ্ধিমান নয়।

এই শ্লোকে অর্জুনকে যে *অনঘ* বলে সম্বোধন করা হয়েছে, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তার অর্থ হচ্ছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ সব রকম পাপ থেকে মুক্ত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারা সম্ভব নয়। মানুষকে সব রকমের পাপের কলুষতা থেকে মুক্ত হতে হবে। তখনই কেবল সে উপলব্ধি করতে পারবে। কিন্তু ভক্তিযোগ এতই শুদ্ধ ও শক্তিশালী যে, কেউ যখন একবার ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত হয়, তখন সে আপনা থেকেই সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

পূর্ণ কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে শুদ্ধ ভক্তসঙ্গে যখন ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করা হয়, তখন কতকগুলি প্রতিবন্ধককে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করার প্রয়োজন হয়। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে হৃদয়ের দুর্বলতা। প্রথম অধঃপতনের মূল কারণ হচ্ছে জড়া প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করার অভিলাষ। এভাবেই জীব পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমভক্তি পরিত্যাগ করে। হৃদয়ের দ্বিতীয় দুর্বলতা হচ্ছে জড় জগতের উপর আধিপত্য করার প্রবণতা। এই প্রবণতা যতই বৃদ্ধি পায়, ততই সে জড়ের প্রতি আসক্ত হয় এবং সে জড়ের উপর তার আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে। এই হৃদয়ের দুর্বলতাগুলিই হচ্ছে জড় অস্তিত্বের কারণ। এই অধ্যায়ের প্রথম পাঁচটি শ্লোকে হৃদয়ের এই সমস্ত দুর্বলতা থেকে মানুষকে মুক্ত হওয়ার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে এবং এই অধ্যায়ের বাকি অংশে ষষ্ঠ শ্লোক থেকে শেষ পর্যন্ত *পুরুষোত্তম-যোগ* নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ভক্তিবেদান্ত কহে শ্রীগীতার গান ।
শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ ॥

ইতি—পরম পুরুষের যোগতত্ত্ব বিষয়ক 'পুরুষোত্তম-যোগ' নামক শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।